মা সুলেখা আর কথা বাড়াতে পারেন না। নিজেও ডিএমসি আর সিএমসির পার্থক্য বোঝে না এমন নয়। কিছুদিনের মধ্যে ঋভুও বাসা ছাড়বে। সেকারণে মেয়েকে কাছে রাখতে চেয়েছিলেন।

প্রথম ক'টাদিন পিসির বাসায় থাকলেও অচিরেই হোস্টেলে সিট হয়ে যায়–এখন বেশিরভাগ সময়ই হোস্টেলে কাটে ঋতির। তবে হুট করেই ট্রেনে চট্টেশ্বরীর বাসায় চলে যায় ঋতি। বাবা একদিন বললো–হ্যারে মা, মেডিকেলে ফার্স্ট ইয়ার-সেকেন্ড ইয়ার একটু কঠিনই, এভাবে চলে আসলে হবে কি। –ও তুমি ভেবো না বাবা, আমি পারবো। ঋভুটাকে না দেখে আমার চলে না বাবা।

হয়তো ট্রেন থেকেই নেমে বাসায় পৌঁছতে-পৌঁছতেই মুঠোফোনে ঋভুর খোঁজ।

– আমিতো কোচিং-এ যাচ্ছি দিদিভাই।

– আজ বাদ দে। আমি আসছি তোর জন্য। তুই কোচিং নিয়ে আছিস। আজ যেতে হবে না, বাসায় থাক। রিকশায় ঘুরবো, মামির বাসায় যাবো; দিদিমনিকে দেখে আসবো, আর বাইরে খাবো।

ঋভু তখন বুয়েটে ভর্তির জন্য ঢাকায়। ও পায় মেকানিক্যাল। দিদি বলে–কীরে খুবতো বলছিলি। এবার বুয়েটের ফার্স্ট চয়েস নিশ্চয়ই মেকানিক্যাল ছিলো না। ইলেকট্রিকাল না হয় পেলি না, কিন্তু সেকেন্ডটা, আই মিন কমপিউটার।

– ওসব সাবজেক্ট-টাবজেক্ট না, রেজাল্টই হলো আসল, দেখিস দিদি।

ঋভুও উচ্চ মাধ্যমিকে দিদির মতোই অসাধারণ রেজাল্ট করেছে। ভাই-বোনে মিলে চারটে গোল্ডেন। জিপিএ-র যুগে কে আগে, কে পরে তা তুলনা করা যায় না। আগের নিয়মে বোর্ডে কুড়িটা প্লেস থাকলে হয়তো ভাই-বোনের পার্থক্য নিরূপণ করা যেত–যদিও একটি বছরের বোর্ড ফলাফলের সঙ্গে আরেক বছরেরটি ঠিকঠিক তুলনীয় ছিলো না।

ততদিনে ঋতি থার্ড ইয়ারে ওঠে গেছে–ফার্স্ট হয়েছে ফার্স্ট প্রফে। সেকথা শুনিয়ে ঋভুকে কষ্ট দিতে চায় না দিদি। সহোদররা থার্ড ইয়ারের শেষে ভাইয়ের ফার্স্ট ইয়ারের রেজাল্টও ভালো হয় না। কিছুই বলে না ঋতি। কিন্তু বাবা ফোন করলেই বলে–ঋভুর কী হয়েছে রে মা।

– বুয়েটে প্রথম-প্রথম অমন হয় বাবা। ঋতি বাবাকে ফোনে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে। দেবেন মিত্রও মেনে নেন–ভাইকে আগলে রাখছে ঋতি।

ঋভুর সেকেন্ড ইয়ারের মাঝামাঝি তখন। সেদিন ক্লাশেও যায়নি। দুপুরের দিকে দিদিকে মোবাইলে খুব করে পেতে চাইছে। দিদি ধরছে না। মনে হলো, দিদির ক্লাশ আছে। অতএব জরুরি টেক্সট–ক্লাশ থেকে বেরোলেই ফোন করবি, খুব জরুরি।

থার্ড ইয়ারের শেষভাগ–টানা ক্লাশ চলছে। আধা ঘন্টার বিরতি–খাওয়ার পরেই আবার ক্লাশ আছে। ফোন অন করতেই ঋভুর মেসেজ। পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে সেন্ট করা হয়েছে। দেখেই অস্থির হয়েই ফোন করলো ঋতি।

– তুই কইরে দিদিভাই। রিং পেয়েই উত্তর দেয় ঋভু।

– এইতো ক্লাশ থেকে বেরুলাম। তোর ক্লাশ নেই বুঝি।

– না, আজ-না ঠিক ক্লাশে যাইনি দিদি। তোর কী সময় হবে–আমি এখনি আসছিরে।

– পরের ক্লাশটা জরুরি ছিলো। ওকে ঠিক আছে, চলে আয়।

মেয়েদের হোস্টেলের গেটেই পাগলের মতো জড়িয়ে ধরলো দিদিকে।

– হয়ে গেছে দিদি, ইউরেকা। এবার বোঝ।

কিছুই বুঝতে পারে না ঋতি। ভেবেছিলো–কোনও সমস্যা কিনা। ঋভুর চোখে-মুখে এভারেস্ট বিজয়ের আনন্দ। মুখে কিছু না বলে দিদির দিকে একটা কাগজ বাড়িয়ে দেয়। কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে নেয় ঋতি।